মিশরীয় উত্থান, সিরিয় গোলক ধাঁধাঁ এবং বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীরা

শুজা রশীদ

নীল নদের দেশ মিশর। উর্বর, নদী বাহিত উপত্যকাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠেছিলো এক সুজলা সফলা সভ্যতা, উন্নত সমাজ ব্যবস্থা। উন্নয়নের অনেক দিকে অগ্রসর হলেও সুউচ্চ ইমারত এবং স্থাপত্য নির্মানে তাদের ব্যুৎপত্তি আজও পিরামিড, স্ফিংস এর মত উদাহরণের ভেতর দিয়ে বেঁচে আছে। সভ্যতার সেই শীর্ষ থেকে অনেক কাল আগেই পতিত হয়েছে মিশর। কিন্তু হঠাৎ করেই এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে যেন সেই অস্তমিত সুর্য থেকে আবার জ্বলে উঠেছে নতুন উদ্দিপনার আগুন। আরব উত্থানের ফলে দীর্ঘকালিনের শাসক হোসনে মুবারাক সরকারের পতনের পর মিশরের জনতার মধ্যে যে নতুন স্বপ্নের জাগরন হয়েছিল, যেভাবে একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে গ্রহণ করবার আকুলতা এবং উদগ্রীবতা দেখা দিয়েছিল তার পরিণতিতে খুবই স্বল্প ভোটের ব্যাবধানে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন মুসলিম ব্রাদারহুডের সমর্থন পুষ্ট মোহাম্মদ মর্সি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালে প্রায় সমান সমান ভাবে বিভক্ত মিশরীয় দুই শিবিরের জনতাকে – ধর্মপন্থি এবং ধর্ম নিরপেক্ষ - একই প্লাটফর্মের নীচে সংযুক্ত রাখার প্রয়াস না করে মর্সি তার সকল ডিক্রিকে যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জের বহির্ভুক্ত করা সহ জনতার অভ্যুত্থানকে জীবিত রাখার প্রয়াস বলে চিহ্নিত করে নিজেকে যে কোন ধরনের পদক্ষেপ নেবার পরিপূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেন। ফলস্বরুপ উদারচেতা এবং ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলি দ্রুত নিজেদেরকে সরিয়ে নেয় তার ছত্রছায়া থেকে। তাদের ভীতি ছিলো মর্সি দ্রুত মিশরকে কঠোর ধর্ম ভিত্তিক প্রশাসনের দিকে ঠেলে দেবার ধান্দা করছেন। মিশরের নতুন ফারাউন বলে চিহ্নিত মর্সির বিরুদ্ধে দ্রুত গড়ে ওঠে জনমত এবং সৃষ্টি হয় আরেক অগ্নুৎপাতের – এবার মর্সির ধর্মপন্থী সমর্থক এবং ধর্ম নিরপেক্ষ বিরোধী পক্ষের মধ্যে। প্রচুর দাংগা হাঙ্গামার পর আর্মির হস্তক্ষেপে এবং ইসলামিস্ট গ্রুপ মুসলিম ব্রাদারহুডকে পুনরায় বেআইনি ঘোষনা করবার পর পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। যাই হোক, মিশরের ঘটনাবলী এবং তার সত্যতা ও ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মুনির নান মত থাকতে পারে কিন্তু যে কথাটি অবধারিত ভাবে সত্য তা হচ্ছে ধর্ম ভীরু মানুষেরাও আর ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতিতে আগের মত আগ্রহী নয়। মিশরের সিংহভাগ অধিবাসীরা মুসলিম হলেও তারা ধর্মের নামে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে দেশের সকল ক্ষমতাকে কুক্ষিগত হবার সুযোগ করে দিতে চায়নি। ব্রাদারহুডের সাথে হাত মিলিয়ে মিশরকে কি ইরানের মত আরেকটি দেশে পরিণত করতে চেয়েছিল মর্সি? হয়ত। নিদেন পক্ষে আর্ধেক

মিশরীয়রা তাই বিশ্বাস করেছে। আর তার পরিণতি হিসাবেই মিশরেই বলা যায় প্রথম বারের মত মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মুসলিমদের দুই বিপরীত স্রোত। আপাতত আর্মির তত্বাবধায়নে সেখানে ক্ষনিকের শান্তি বিরাজ করলেও এই বিরোধীতা যে আবার মাথা চাগিয়ে উঠবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ধর্মের নামে মিশরীয় খ্রীস্টানদের হত্যা, বিদেশীদেরকে আক্রমণ করা এবং স্বধর্মীদেরকে বিশেষ পদ্ধতিতে ধর্ম পালন করতে বাধ্য করা – এই জাতীয় স্বেচ্ছাচারীতা সংখ্যা গরিষ্ট মুসলিমরা যে চুপচাপ মেনে নেবে না তা প্রমাণ করেছে মিশরের ধর্ম নিরপেক্ষ জনগোষ্টি। সম্ভবত সেই দিন আর বেশী দেরি নেই যখন সারা পৃথিবীর উন্নত মনষ্ক মুসলমানেরা রুখে দাঁড়াবে সেই সব জালিমদের বিরুদ্ধে যারা পশ্চিমীয় দেশগুলিকে স্বাচ্ছাচারীতার দোষারোপ করে নিজেরাই মেতে উঠেছে হত্যাযজ্ঞে। হয়তো সময় এসেছে এই সব ইসলামিস্ট খুনীদেরকে নব্য যুগের জালিম বলে সনাক্ত করবার। কেনিয়ায় সদ্য ঘটে যাওয়া সোমালিয়ার আল-শাবাবের টেরোরিস্টদের হাতে অসহায় অনেকগুলি প্রাণের হানি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে কি তারই জ্বলন্ত উদাহরণ তুলে ধরছে না?

প্রায় প্রতিটি মধপ্রাচ্যের আরব দেশগুলির মত জটিল আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সিরিয়া স্থিতিশীল থেকেছে দীর্ঘদিন। সিরীয় নেতা হাফিজ আল আসাদ ক্ষমতায় আসবার পর সেকুলার সমাজ ব্যবস্থা গড়ার নামে ধীরে ধীরে সকল প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। কিন্তু সুন্নি মুসলিম গ্রুপগুলো তার অধিনায়কত্ব মানতে আনাগ্রহ দেখিয়ে বিরোধিতা করতে উদ্যত হলে তাদেরকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। পরবর্তিতে বাশার আল আসাদ ক্ষমতায় এলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে বলে অনেকেই আশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে তার উল্টোটাই হয়। ২০১১ সালে রাজনৈতিক উন্মুক্ততা এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু হয় এবং দ্রুত তা সিরিয় আর্মি এবং সশস্ত্র বিরোধী দলের মধ্যে গৃহ যুদ্ধে পরিণত হয়। গত মাসগুলিতে শুধু যে নারী পুরুষ বালক বালিকাদেরকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে তাই নয়, সরকারী এবং সম্ভবত বিরোধী পক্ষও ব্যবহার করেছে রাসায়নিক অস্ত্র। সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি জটিল পরিস্থিতির। এক দিকে বাশার আল আসাদ এবং সিরিয় আর্মি যাদের অভিমত বিপক্ষীয় যোদ্ধারা মুলত টেররিস্ট যাদের উদ্দেশ্য সিরিয়াকে ধ্বংশ করা এবং অন্য দিকে রয়েছে নানা গোত্র থেকে আসা জোটবদ্ধ হওয়া যোদ্ধারা যাদের মন মানসিকতা এবং অভিমত সবক্ষেত্রে এক নয়। তাদের কার কি উদ্দেশ্য সেটা এখনও পরিপূর্নভাবে পরিষ্কার নয়। বাশার আল আসাদের যদি পতন হয় তাহলে তাদের মধ্যে কে ক্ষমতা কুক্ষিগত করবে এবং কি জাতীয় শাসনতন্ত্রের সৃষ্টি হবে তা আদৌ পরিষ্কার নয়। কিন্তু সেই ভবিষ্যতের কথা আপাতত ভুলে গিয়ে বলা যায় এই গৃহ যুদ্ধে যে পরিমাণ নৃশংসতা উভয় পক্ষ থেকেই প্রদর্শিত হয়েছে তাতে বিজয়ের আনন্দ কতখানি আনন্দমুখর হবে তাতে সন্দেহ আছে। সরকারী পক্ষ যেমন নির্বিচারে হত্যা করেছে নিরীহ মানুষ জনকে তেমনি বিপক্ষও দেখিয়েছে অনভিপ্রেত নিষ্ঠুরতা। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় জনৈক কমান্ডারের মৃত এক সিরিয় সৈনিকের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে খাওয়া এবং সেই দৃশ্য ইউটিউবে উঠে যাওয়া। এই জাতীয় আচরণ কখনই বিশ্ব দরবারে ভালো দৃষ্টীতে দেখা হয় না।

মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে বিপক্ষের এলাকায় রাসায়নিক বোমা ফেলে হত্যাকান্ড ঘটানোর অভিযোগে পশ্চিমীয় দেশগুলো সিরিয়ার উপর আক্রমনাত্বক হয়ে ওঠায় রাশিয়া দ্রুত এগিয়ে এসে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে সাহায্য করেছে এবং আরেকটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া থেকে আপাতত পৃথিবী রক্ষা পেল কিন্তু এই অবসরে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সকলের দৃষ্টী আকর্ষণ করেছে। আমেরিকা, ব্রিটেনের সাধারণ জনতার মতামত চাওয়া হলে তাদের অধিকাংশই নীরিহ সিরীয়দের অকাল মৃত্যু দেখেও তাদের সরকারকে সেই দেশে গিয়ে রক্ষাকর্তার ভুমিকা পালন করবার অনুমতি দিতে আগ্রহী হয় নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি ভালো কিছুর ইঙ্গিত নাকি মন্দের? একটু খতিয়ে দেখা যাক।

এটি পরিষ্কার হয়েছে যে মুসলিমদের মধ্যে এই ব্যাপারে মতদ্বন্দ কিছু থাকলেও অধিকাংশই মনে করেন পরিস্থিতি যাই হোক আমেরিকা বা পাশ্চত্যের সেখানে নাক গলানোর কোন প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে এই জাতীয় অনুপ্রবেশ অযাচিত এবং উদ্দ্যেশ্যপ্রণোদিত। কিন্তু তাদের অনেকেই ভুলে যান অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল কিংবা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীরা ভয়ানক অত্যচার অবিচারের শীকার হয় এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার মত না থাকে তাদের ক্ষমতা না অস্ত্র এবং অর্থ বল। তখন তারা হয় অসহায়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় নয়তো প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। সবাই সফল হতে পারে না। সিরিয়ায় খুব সম্ভবত এখন সেই জাতীয় পরিস্থিতির সৃষ্টী হয়েছে। সেখানে সশস্ত্র গৃহ যুদ্ধের দিকে ঘটনা মোড় নিলেও সিংহ ভাগ মানুষ স্রেফ জান হাতে নিয়ে দিন গুজরান করছে। এই জাতীয় পরিবেশে রাসায়নিক অস্ত্রের মুখে নিজেদেরকে রক্ষা করবার মত কি সুযোগ থাকতে পারে সাধারণ মানুষের কাছে? পরাশক্তির কাছে সাহায্যের আবেদন করার যদি কোন সময় কখনই আসে এটি ঠিক সেই সময়। কিন্তু আফগানিস্থান এবং ইরাকের ঋণাত্বক অভিজ্ঞতার পর আমেরিকা এবং বৃটেনের সাধারণ জনতাও হয়ে উঠেছে বৈরী। ভবিষ্যতে নিরীহ মানুষেরা যদি স্বৈরাচারী শাসক কিংবা গোষ্ঠীর হাতে নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হয় তখন তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে যাবার আগ্রহী শক্তির অভাব হলে কাউকে দোষারপ করা যাবে না। সিরিয়ার ভুক্তভোগিরা আপাতত কোন সাহায্য পাবে না।

বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হচ্ছে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় উদবুদ্ধ এই স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিরা শুধু শত্রুর সাথে হাতই মেলায় নি তারা হত্যাযজ্ঞও চালিয়েছে বাংলাদেশের মাটিতে। তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই অভিযোগ প্রমান হয়েছ কোর্টে, কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। সেই বিচারকার্য নিয়ে কারো কোন দ্বিমত আছে কিনা সেটা আমার বিচার্য নয় কিন্তু প্রশ্ন করবো ধর্মীয় বিশ্বাসকে ব্যবহার করে বর্বতা এবং নৃশংসতার শেষ কি কখন হবে? এবার কি সময় এসেছে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করে এই পৃর্থিবীতে যারা নারকীয় নৃশংসতাকে টেনে এনেছে তাদেরকে এক বাক্যে নাকচ করে দেবার? ধর্ম বিশ্বাস একটি ব্যাক্তিগত ব্যাপার। যখন কিছু ধর্মীয় প্রেরণায় উদবুদ্ধ মানুষ অন্যের অধিকার এবং ব্যাক্তিস্বত্তাকে তুচ্ছ করে নিজস্ব বিশ্বাসের ওজন অন্যদের উপর নির্বিচারে চাপিয়ে দিতে চায়, প্রয়োজনে হত্যা, নির্যাতন, নৃশংসতার আশ্রয় নিতে পিছপা হয় না তখন মিশরের

অসংখ্য সেকিউলার মুসলিমদের মত যারা বন্যার পানির মত নেমে এসেছিলো রাস্তায়, তীব্র প্রতিবাদে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো মিশরের রাজনৈতিক প্রাংঙ্গনকে দ্বিতীয়বারের মত, আমাদেরো কি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠা উচিত নয়? নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করবার লাইসেন্স তাদেরকে আল্লাহ কবে কোথায় কিভাবে দিয়েছেন? সব কিছুকে জেহাদ বলে চালিয়ে দিয়ে হত্যাকান্ড আর নির্মমতাকে প্রথাবদ্ধ করবার অধিকার তাদেরকে কে দিয়েছে? আল্লাহর নামে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালানোর সুযোগ ইসলাম শুধু নয়, কোন ধর্মেই নেই। এই সব হত্যাকারীদের ফাঁসিই যথপযুক্ত শাস্তি।